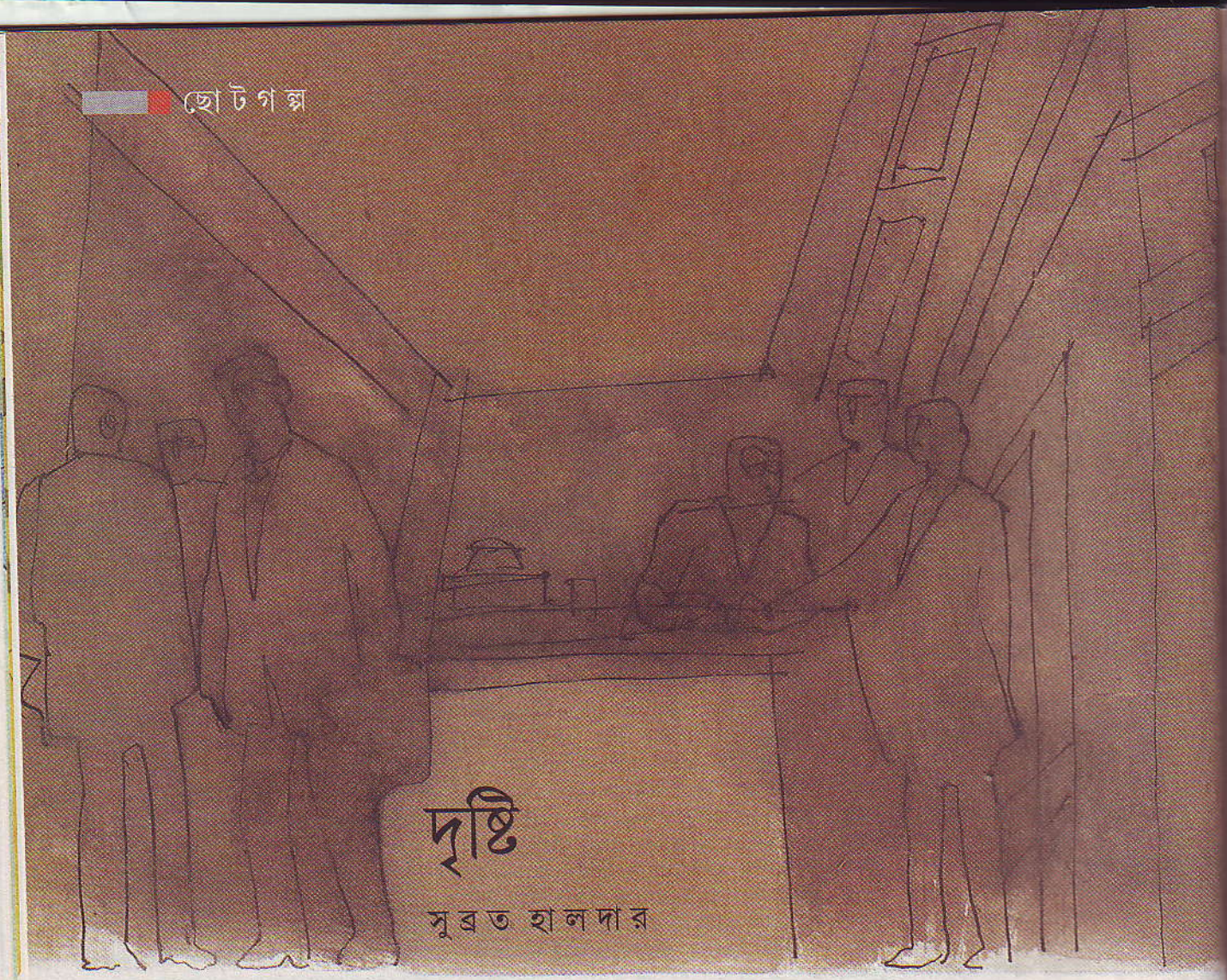

দৃষ্টি

সুব্রত হালদার

শুভেন্দু চাবির গোছাটা নিয়ে বড়সাহেবের টেবিলের সামনে গিয়ে দাঁড়াল। অফিস সবে খুলেছে, হাতে চাবির গোছা... বড়সাহেব সম্ভবত ওর মনের কথাটা পড়ে ফেলেছেন বলেই মনে হল। শুভেন্দু সময় নষ্ট না করে কথাটা পেড়েই ফেলল, স্যার, কয়েকদিনের ছুটি চাই, একটা সমস্যায় পড়েছি।

বড়সাহেব, অর্থাৎ কোম্পানির প্রোপ্রাইটর কাম ম্যানেজিং ডিরেক্টর মিস্টার সরখেল টেবিলের ওপরে রাখা ল্যাপটপে কিছু একটা করছিলেন। ল্যাপটপটা ডানদিকে সরিয়ে রেখে শুভেন্দুর চোখে চোখ রেখে তিনি প্রশ্ন করলেন, ছুটি... সমস্যাটা কী?

গলায় উদ্বেগের আভাস থাকলেও 'ছুটি' কথাটা বড়সাহেবকে চিন্তায় ফেলেছে এটা শুভেন্দু বুঝতে পারল। বড়সাহেবের চোখে চোখ রেখে কথা বলতে শুভেন্দু কোনওদিনই পারে না। শুভেন্দু বলল, গত পরশু, অর্থাৎ শনিবার রাতে আমার ওয়াইফের চোখে একটা সমস্যা হয়েছে। ডান চোখটায় ঝাপসা দেখছে, দৃষ্টি প্রায় নেই বললেই চলে...

শুভেন্দুর কথার মাঝেই বড়সাহেব প্রশ্ন করলেন, সে কী! ডাক্তার দেখিয়েছেন?

—হ্যাঁ, কালকে একজন আই স্পেশ্যালিস্ট-এর কাছে নিয়ে গিয়েছিলাম। উনি পরীক্ষা-টরিক্ষা করে বললেন আই স্ট্রোক। খুব তাড়াতাড়ি চিকিৎসা শুরু না হলে ডান চোখটা চিরকালের মতো দৃষ্টি হারাবে। এও বললেন যে, এই রোগের চিকিৎসার ভাল বন্দোবস্ত এখানে নেই। সাউথের একটা হসপিটালে রেফার করলেন।

শুভেন্দু প্রেসক্রিপশনটা বড়সাহেবের দিকে এগিয়ে দিল। বড়সাহেব প্রেসক্রিপশনটায় চোখ বোলানোর মাঝেই শুভেন্দু বলল, তাই এখনই হাওড়া বা কয়লাঘাটায় যেতে হবে। এমনিতে তো আজ বা কালের রিজার্ভেশন পাব বলে মনে হয় না, তবে চিকিৎসার কাগজপত্র দেখালে ব্যবস্থা হয়ে যায় বলে শুনেছি। দিন চার-পাঁচেকের মধ্যে চিকিৎসা শুরু না হলে আর কোনও আশা নেই।

শুভেন্দুর শেষ কথাটার সঙ্গে বেরিয়ে আসল একরাশ হতাশা। বড়সাহেব প্রেসক্রিপশনটা খুঁটিয়ে

পড়লেন। তারপর ওটা শুভেন্দুর হাতে ফিরিয়ে দিয়ে বললেন, কিন্তু আজকে তো আপনার সেলস ট্যাক্স অফিসে যাওয়ার কথা। ফাইনাল হিয়ারিং-এর ডেট আছে। এমনিতেই কেসটা খুব জটিল। এদিক-ওদিক হয়ে গেলে কোম্পানির বিরাট ক্ষতি হয়ে যাবে। আপনি ছাড়া তো কেউ ওটা হ্যান্ডেল করতে পারবে বলে মনে হয় না।

কিছুক্ষণের নীরবতা। সমস্যার সমাধানে দু'জনেই অন্ধকারে পথ হাতড়াচ্ছে। বড়সাহেবই আবার শুরু করলেন, এক কাজ করুন। এগারোটায় তো হিয়ারিং। আমি বরং আমার গাড়িটা দিয়ে দিচ্ছি। চট করে গিয়ে ওটা সেরেই ফিরে আসুন। তারপর না হয়... বড়সাহেবের গলার স্বরেই বোঝা গেল দায়িত্ব ওঁকে স্বার্থপর করে তুলেছে সেটা উপলব্ধি করেই কথাগুলো বললেন।

শুভেন্দু নিজের চেয়ারে ফিরে এল। স্বভাবগতভাবে জোর খাটানো বা যুক্তি-তর্ক দিয়ে নিজের দাবি আদায় করার শক্তিটায় অনভ্যাসে অনেকদিন আগেই মরচে ধরে গিয়েছে। ভালমানুষ ধরনের চালচলনের জন্য মাঝেমাঝেই যে ওকে সমস্যায় পড়তে হয়, সেটা বুঝেও কিছু করার থাকছে না। আজ যেমন বড়সাহেব কিছু ভুল বলেননি। অন্য দিকে, আজ এ অবস্থায় সব কিছু অগ্রাহ্য করা কি উচিত ছিল না? শুভেন্দু সিদ্ধান্তে আসতে পারে না। পকেট থেকে টাকাগুলো বের করে ড্রয়ারে রাখল। ড্রয়ারটায় চাবি দিল। অনেকগুলো টাকা। স্লিপার ক্লাস যদি না পায় তবে এসি-থ্রি টিয়ার কাটতে পারে। সেই চিন্তা করে একটু বেশি করেই টাকা এনেছে। মনে-মনে প্রার্থনা করল যাতে স্লিপার ক্লাসই জুটে যায়। সামনে কত খরচ কে জানে! যাতায়াতে যত কম খরচ হয় ততই মঙ্গল। ফাইলগুলো আগের দিনই গুছিয়ে রেখে গিয়েছিল। সেগুলো ব্রিফকেসে ভরে দ্রুত নীচে নেমে এল। চ্যাটার্জি ইন্টারন্যাশনাল-এর উল্টোদিকে পার্কিংয়ে গাড়িটা থাকে। ঢাউস গাড়িটা চড়ার সুযোগ শুভেন্দুর মাঝেমাঝেই হয়। অন্য দিন একটা খুশির আমেজ থাকে। আজ সব কিছুই মূল্যহীন বলে মনে হচ্ছে। ধর্মতলার মোড় থেকে গাড়িটা রাইট টার্ন নিয়ে লেনিন সরণি ধরবে। এখানে রেড সিগনালে কিছুক্ষণ আটকে থাকাটা নিত্যনৈমিত্তিক। আজ শুভেন্দু মনের মধ্যে একটা অস্থিরতা বোধ করছে। সব কিছু যেন ধীর গতিতে চলছে। গা-ছাড়া ভাব।

মৌলালি যুবকেন্দ্রের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় মনে পড়ে গেল সেদিনের কথা। এখানেই পিয়ালির সঙ্গে তাঁর প্রথম দেখা। পূর্বাঞ্চল শিল্প-বিজ্ঞান মেলা না কী একটা চলছিল। দূর-দূরান্ত থেকে আসা অনেক স্কুল-ক্লাব-সংগঠন তাতে অংশগ্রহণ করেছিল। যেহেতু ক্ষমতাসীন দলের পৃষ্ঠপোষকতায় হচ্ছিল, তাই প্রচারও হয়েছিল বেশ। পিয়ালিরা এসেছিল দুর্গাপুরের কোনও একটা ক্লাবের পক্ষ থেকে। কাছেই একটা স্কুলে ক্যাম্প করে ছিল। পিয়ালির আঁকা ছবিটা দ্বিতীয় পুরস্কার পায়। একটা বিস্তীর্ণ সুবজ মাঠ, মাঝখান দিয়ে কাঁচা রাস্তা চলে গিয়েছে বহু দূরে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে থাকা তালসারির দিকে। শুভেন্দুর ছবিটা খুবই সাদামাটা বলে মনে হয়েছিল। তবে এখনও মনে আছে বিচারক কী বলেছিলেন। একদল ছেলেমেয়েকে নিয়ে ছবি দেখতে দেখতে বিচারক মহাশয় দাঁড়িয়ে গিয়েছিলেন ছবিটার সামনে। ভিড়ের দিকে ফিরে বললেন, ছবিটা কার আঁকা? ভিড়ের পিছন থেকে একটা লাজুক কণ্ঠ জানান দিল তার উপস্থিতি। বিচারক ভদ্রলোক পিয়ালিকে কাছে ডেকে নিলেন। কাঁধে হাত রেখে বললেন, বাঃ, বেশ এঁকেছ। ভিড়ের চঞ্চলতা উপলব্ধি করে বললেন, কেন ভাল বললাম জানো? রাস্তাটা দেখো, কোনও স্কেল-ফিতে ছাড়াই বলে দেওয়া যাবে ওটার দৈর্ঘ্য কত। মনের ভাবের এতটাই নিখুঁত প্রতিস্থাপন। এটা

শুধু আঁকার কলাকৌশল রপ্ত করলেই সম্ভব না। হাত, চোখ, মনকে একসূত্রে গাঁথতে পারলেই এটা সম্ভব। তারপর ছবির দিকে ফিরে ছবিটা দেখতে দেখতে বললেন, তোমরা খেয়াল করেছ কি, ছবিটা দেখেই বলে দেওয়া যায় এটা কোন মাস, দিনের কোন সময়ের চিত্র। এই জন্যই বলে সার্থক চিত্রকলা শুধু রেখায়-রঙে আবদ্ধ থাকে না। ছবি কথা বলে। অনেক কথা বলে। কেউ বুঝতে পারে কেউ পারে না।

এর পরেও প্রদর্শনীটা দিনচারেক চলেছিল। তখন পিয়ালির সঙ্গে মৌখিক আলাপ। ভিতরে একটা টান যে অনুভব করেনি তা নয়। পিয়ালির চোখের ভাষাও বলত ভলেন্টিয়ার-ইন-চার্জ স্মার্ট সুদর্শন কিশোরটিকে ওর অপছন্দ নয়। কিন্তু প্রদর্শনী শেষে পিয়ালি ফিরে যায় দুর্গাপুরে। শুভেন্দু কলকাতায়। হয়তো নিউটনের থিওরি অনুযায়ী দূরত্ব টানকে দুর্বল করে দেয়। অথবা সময়। পিয়ালির সঙ্গে আবার দেখা বঙ্গবাসী কলেজে। পিয়ালি কমার্স নিয়ে গ্র্যাজুয়েশন কোর্সে ভর্তি হয়। নারকেলডাঙায় মাসির বাড়িতে এসে উঠেছিল। শুভেন্দু তখন দ্বিতীয় বর্ষে। প্রথম দর্শনেই দু'জনের কাছে পরিষ্কার হয়ে যায় টানটা মোটেই দুর্বল হয়ে যায়নি। ওটা বোধহয় বাস্তবের আস্তরণের নীচে চাপা পড়ে ছিল, ঘটনাচক্রের কোমল হাত আস্তরণ সরিয়ে ওদেরকে আবার একাত্ম করে দিল।

সামনের ঘটনাটা শুভেন্দুকে বর্তমানে ফিরিয়ে আনল। গাড়িটা সবে বেলেঘাটা রোড ধরবে। শুভেন্দু দেখল, সামনে দাঁড়ানো একজন ট্র্যাফিক পুলিশ গাড়িটাকে সাইড করার নির্দেশ দিচ্ছেন। ড্রাইভার রাজু গাড়িটা সাইড করে নেমে গেল। বিরক্তিতে শুভেন্দুর মন ভরে গেল। জ্যাম-জটে এমনিতেই গাড়ি এগচ্ছে না। প্রায় সাড়ে দশটা বাজে। একটু আগে আগে পৌঁছবে ভেবে রওনা হয়েছিল। এখন এগারোটার মধ্যেও পৌঁছনো যাবে কিনা সেটাই সন্দেহ! রাজু কিছুক্ষণের মধ্যেই ফিরে আসল। শুভেন্দু বলল, কী হল, হঠাৎ দাঁড় করাল কেন?

রাজু বিরক্ত স্বরে বলল, আর বলবেন না। বেল্টটা গলা দিয়ে গলিয়ে রেখেছিলাম, লক করিনি। ব্যাটা ঠিক খেয়াল করেছে। আসলে ধান্দাপানি...।

শুভেন্দু বিরক্ত স্বরে বলল, এমনিতেই খুঁড়িয়ে-খুঁড়িয়ে চলতে হচ্ছে, তার ওপর আবার বেল্ট! কার যে কী মানে সেটাই বোঝে না। বেল্ট চেক করতে হয় তো হাইওয়েতে গিয়ে দাঁড়া না বাবা! পরক্ষণেই খেয়াল হল কারণে-অকারণে এতটা উত্তেজিত হওয়া ঠিক হচ্ছে না। নিজেকে সংযত করার জন্য পিছনে হেলান দিয়ে চোখ বুজল। হিয়ারিংয়ের ইস্যুগুলো একবার ঝালিয়ে নিতে হবে। এক যুদ্ধের মধ্যে আর এক যুদ্ধ। এভাবেই কয়েকদিন চলবে, তাই মনটা শান্ত রাখা দরকার।

গাড়িটাকে পার্ক করার সুযোগ না দিয়ে সেলস ট্যাক্স অফিসের গেটেই শুভেন্দু নেমে পড়ল। হাতে আর মাত্র কয়েক মিনিট সময়। সিঁড়ি দিয়ে দ্রুতপায়ে তিনতলায় উঠে গেল। সার্কেল ইন্সপেক্টর মিস্টার গৌতম চ্যাটার্জির চেম্বারটা চেনা। মৌখিক আলাপও আছে। সেই সূত্রে শুভেন্দু সুইংডোরটা ঠেলে মুখ বাড়াল। মিস্টার চ্যাটার্জি সম্ভবত শুভেন্দুর জন্যই অপেক্ষা করছিলেন। শুভেন্দুকে ডেকে নিলেন। শুভেন্দু ফাইলপত্র তৈরি করেই নিয়ে এসেছিল। এক-একটা পয়েন্ট ধরে শুভেন্দু কোম্পানির হয়ে ডিফেন্ড করতে লাগল। কিন্তু প্রায় চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশ মিনিট আলোচনার পরও দু'জনে সব ব্যাপারে ঐক্যমতে পৌঁছতে পারল না। ব্যাপারগুলো ঠিকঠাক বোঝাতে পেরেছে বলে শুভেন্দুর বিশ্বাস। কিন্তু এসব ক্ষেত্রে যেটা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ তা হল, অন্য পক্ষ কতটা বুঝতে চায়। শুভেন্দু বেশ বুঝতে পারছে যে, মিস্টার চ্যাটার্জি সবটা বুঝতে চান না। অন্য কেসগুলোর সুরাহা হলেও একটা কেস নিয়ে তিনি গোঁ ধরে বসে আছেন। কয়েক মাস আগে ওদের কোম্পানি একটা মেশিন মুম্বইয়ের এক পার্টিকে সেল করেছিল। ইনভয়েসে মেশিনটার নামই ছিল। কিন্তু তার সঙ্গে যেসব অ্যাকসেসরিজ যায়, তার কোনও উল্লেখ ছিল না। কোনওদিন থাকেও না। কিন্তু এক্ষেত্রে সাডেন ইন্সপেকশনের দায়িত্বে থাকা অফিসার 'ইনসাফিশিয়েন্ট ডিক্লারেশন লিডস টু সাসপেক্টেড আন্ডার ইনভয়েসিং' বলে নোট দিয়ে দেয়। শুভেন্দু যন্ত্রটার ক্যাটালগ দেখিয়ে, টেকনিক্যাল রিজিন এক্সপ্লেন করে বোঝানোর অনেক চেষ্টা করে যে, তাদের কোম্পানির কোনও অসৎ উদ্দেশ্য ছিল না। ওই অ্যাকসেসরিজগুলি যন্ত্রেরই অংশ। ওগুলো ছাড়া যন্ত্রটা চলবে না। এও মেনে নেয় যে পরবর্তীকালে তারা ইনভয়েসে ডিটেলই রাখবে। কিন্তু মিস্টার চ্যাটার্জি বুঝতে নারাজ। এই ভয়ও দেখাচ্ছেন যে এধরনের যতগুলি যন্ত্র গত কয়েক বছরে সেল হয়েছে তার সবগুলির ওপরই উনি আলাদা করে সেলস ট্যাক্স চার্জ করবেন। তার সঙ্গে ফাইন-টাইন জুড়িয়ে বিশাল অঙ্ক। শুভেন্দুর উৎকণ্ঠা বাড়তে থাকল। আরও একপ্রস্থ আলোচনার পর দু'জনে একটা ভদ্রস্থ ঐক্যমতে পৌঁছল। মিস্টার চ্যাটার্জি রাজি হয়েছেন যে আগের কেসগুলো নিয়ে আর বেশি নাড়াচাড়া করবেন না। কেবলমাত্র ওই ইনভয়েসটার ওপরই অ্যাডিশনাল ট্যাক্স আর ফাইন ধার্য করে ছেড়ে দেবেন। কর্তার ইচ্ছায় কর্ম। বিশেষত সরকারি অফিসে। শুভেন্দু ব্যাপারটা মেনে নিল। না নিয়েও উপায় নেই। কোম্পানি অ্যাপিলে গেলে আরও অনেক সময় লেগে যাবে। সেলস ট্যাক্স ক্লিয়ারেন্স সার্টিফিকেটটা তাড়াতাড়ি না পেলে আরও বড় সমস্যা অপেক্ষা করছে। সামনে কয়েকটা টেন্ডার আছে যেগুলো অ্যাটেন্ড করা যাবে না। সেলস ম্যানেজার মিস্টার বোস এমনিতেই সবার উপর ছড়ি ঘোরান। কিন্তু কোনও দায়িত্ব নেবেন না। এখানে তো ওঁর সঙ্গে আসা উচিত ছিল। ওইসব টেকনিক্যাল ব্যাপার বোঝানোটা অ্যাকাউন্ট-এর কাজ নাকি? তার এই মুখ বুজে কাজ করে যাওয়ার সুযোগটা সবাই নিচ্ছে। আর এত করেও যে প্রশংসা পাবে, তা নয়। কেন শুভেন্দু অ্যাডিশনাল ট্যাক্স আর ফাইনটা উইথড্র করাতে পারল না, সেই নিয়েও হয়তো দু'কথা শুনিয়ে দেবেন।

মিস্টার চ্যাটার্জি ফাইলটায় আর একবার চোখ বুলিয়ে বললেন, আপনি রিসেপশনে গিয়ে অপেক্ষা করুন। আমি অর্ডারটা তৈরি করে ফেলছি। তারপর আপনাকে ডেকে পাঠাব। অর্ডারের একটা কপি নিয়ে গিয়ে চেকটা ডিপোজিট করে দেবেন। তা হলে সপ্তাহ খানেকের মধ্যেই ক্লিয়ারেন্স সার্টিফিকেটটা পেয়ে যাবেন।

শুভেন্দু রিসেপশনে এসে বসল। সোফায় হেলান দিয়ে ক্লান্তিতে চোখ বুজল। মনে পড়ে গেল আর একটা দিনের কথা। সেদিনও ঘড়ির কাঁটা সময়ের আগে ছুটছিল। শুভেন্দু তখন একাদশ শ্রেণিতে। ইংরেজির ফাইনাল পরীক্ষা দিয়ে ফিরছিল। রাস্তা থেকেই চোখ পড়ল বাবা বারান্দায় ইজিচেয়ারে আধশোয়া হয়ে একটা বই পড়ছেন। শুভেন্দু কাছে আসতে মুখ তুলে চাইলেন। জিজ্ঞাসা করলেন পরীক্ষা কেমন হল। শুভেন্দু বলল, ভাল। প্রশ্নপত্রটা বাবার হাতে দিয়ে ঘরের মধ্যে গেল হাত-পা ধুয়ে জলখাবার খেতে। মায়ের কাছে শুনল বাবার শরীরটা ভাল নয় বলে অফিস থেকে তাড়াতাড়ি ফিরে এসেছেন। কয়েকদিন ধরেই নাকি বাঁ হাতটায় অল্প-অল্প ব্যথা হচ্ছিল। আজ অফিসে গিয়ে মাথা ঘুরছিল। অফিসের লোকজনই জোর করে বাড়ি পাঠিয়ে দিয়েছে। সন্ধেবেলা একজন হার্ট স্পেশ্যালিস্ট-এর কাছে চেকআপ করাতে যাবেন। শুভেন্দু জলখাবার খেয়ে বারান্দায় আসতে দেখল প্রশ্নপত্রটা বাবার কোলের ওপর পড়ে। প্রথমে সে ভাবল, বোধহয় ঘুমিয়ে পড়েছেন। একটু কাছে আসতে বুঝল মাথাটা এক দিকে কাত হয়ে পড়ে।

শরীরের সব শক্তি দিয়ে প্যাডেল করেও সাইকেলটা যেন গতি পাচ্ছে না। সময় চলে যাচ্ছে। পাশের বাড়ির গৌতম গিয়েছে অ্যাম্বুলেন্স ডাকতে। গৌতমের বাবা এসব ব্যাপারে অভিজ্ঞ। তিনিই বলেছেন যে অ্যাম্বুলেন্সে তোলার আগে একটা ইন্টারভেনাস ইঞ্জেকশন দেওয়া জরুরি। না হলে এতটা রাস্তা যাওয়া রিস্ক হয়ে যাবে। শুভেন্দু বুঝতে পারছে বাবার জীবন এখন তার হাতে।

শুভেন্দু আবার রিসেপশনে এসে বসল। বেশ বুঝতে পারছে ঘড়ির কাঁটার সঙ্গে সঙ্গে উৎকণ্ঠা বাড়ছে। অনেকদিন পর আজ আবার বুঝছে ঘণ্টা-মিনিট-সেকেন্ডের কী মূল্য। যতক্ষণ না ট্রেনের টিকিটটা কাটতে পারছে ততক্ষণ স্বস্তি নেই। দেখতে দেখতে ঘড়ির কাঁটা একটার ঘর পেরিয়ে গেল। শুভেন্দু আর বসে থাকতে পারল না। মিস্টার চ্যাটার্জির চেম্বারের দিকে গেল। দেখল দরজাটা বাইরে থেকে বন্ধ।

হাতঘড়িটা যেন টাইমবোমা, বুকের সঙ্গে বাঁধা। কাঁটা যত এগচ্ছে ততই আতঙ্ক বাড়ছে। শুভেন্দু ড. নন্দীর বাড়ি পৌঁছে ডোরবেল বাজাল। দেখল দরজাটা খোলাই আছে। সৌজন্য দেখানোর সময় নেই। দরজার কপাট ঠেলে সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠতে লাগল। ড. নন্দী বাবার বন্ধু। সেই সূত্রে আগেও কয়েকবার বাবার সঙ্গে বাড়িতে এসেছেন। ড. নন্দীর সঙ্গে দোতলায় সিঁড়ির মুখে দেখা। শুভেন্দুকে নিয়ে উনি ঘরে গেলেন। শুভেন্দু বলল, কাকু, বাবা অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। আপনাকে এক্ষুনি একবার যেতে হবে। ড. নন্দী কী হয়েছে শুনলেন। তারপর বললেন যে, এই মুহূর্তে তাঁর পক্ষে যাওয়াটা অসুবিধা। বাড়িতে কয়েকজন গেস্ট আসবে। ড. দাসের কাছে যেতে উপদেশ দিলেন, প্রয়োজনে উনিও ফোনে ড. দাসকে অনুরোধ করতে পারেন। শুভেন্দু হিসাব করে নিল যে, ড. দাসের কাছে যাওয়া মানে আরও আধঘণ্টা সময় নষ্ট। চোখ পড়ল টেবিলে রাখা ব্রিফকেসটার দিকে। ওটার মধ্যেই সব প্রয়োজনীয় ওষুধপত্র থাকে। শুভেন্দু ব্রিফকেসটা হাতে তুলে নিয়ে বলল, কাকু, আপনি না গেলে বাবা বাঁচবে না। প্লিজ আপনি চলুন। শেষ কথাটা কান্না জড়ানো গলায় বের হল। ড. নন্দী কী করবেন ভাবতে-ভাবতে শুভেন্দু পিছন ফিরে রওনা দিল। দ্রুত পায়ে সিঁড়ি দিয়ে নীচে নামতে-নামতে বলল, আমি একটা রিকশা ডেকে আনছি।

শুভেন্দুর বাবা সে-যাত্রায় রক্ষা পেয়ে যান। শুভেন্দুর মনে আছে হাসপাতাল থেকে ছাড়া পাওয়ার দিন ডাক্তারবাবু, ড. নন্দীর প্রেসক্রিপশনে দুটো ইনজেকশনকে মার্ক করে বলেছিলেন, ওগুলো দেওয়া হয়েছিল বলেই পেশেন্ট সারভাইভ করে গেল। খুব বড় অ্যাটাক ছিল। ড. নন্দীর সঙ্গে সেদিনের দুর্ব্যবহারের জন্য শুভেন্দুর নিজেকেই অপরাধী মনে হচ্ছিল। অথচ এ ছাড়া কোনও উপায়ও ছিল না। বাবা একটু সুস্থ হতে বাবাকেও ঘটনাটা বলেছিল। বাবা সব শুনে বলেছিলেন যে, উনিই না হয় ড. নন্দীর কাছে ক্ষমা চেয়ে নেবেন। বাবার ঠোঁটের কোণে ছোট্ট হাসিটায় শুভেন্দু বুঝেছিল যে, বাবা তাকে অন্তত‌পক্ষে ক্ষমা করে দিয়েছেন। শুভেন্দু পরদিনই ড. নন্দীর চেম্বারে যায়। ড. নন্দী ওঁকে দেখেই বাবার কথা জিজ্ঞাসা করেন। শুভেন্দু বাবার কুশলবার্তা দিয়ে, ড. নন্দীর পা ছুঁয়ে প্রণাম করে। এও বলে সেদিনের দুর্ব্যবহারের জন্য সে ক্ষমাপ্রার্থী। ড. নন্দী শুভেন্দুর মাথায় হাত রেখে বলেন, তোমার বাবা ভাগ্যবান!

দেওয়ালে টাঙানো ঘড়ির দিকে চোখ পড়তে বুকটা ধক করে উঠল। বারোটা চল্লিশ। শুভেন্দু উঠে মিস্টার চ্যাটার্জির চেম্বারে গেল। মিস্টার চ্যাটার্জি শুভেন্দুকে দেখে বললেন, আরে, এত তাড়াতাড়ি অধৈর্য হয়ে পড়লেন! আপনাকে তো ডাকব বলেছি।

শুভেন্দু বলল, স্যার, আসলে বাড়িতে একটা প্রবলেম হয়েছে। সেই ব্যাপারে এক জায়গায় যেতে...

—সে কী! কী হয়েছে? পুরনো আলাপের সূত্র মিস্টার চ্যাটার্জি একটু গম্ভীরে গেলেন।

—সমস্যাটা ওয়াইফের চোখে। ডাক্তার বলছে

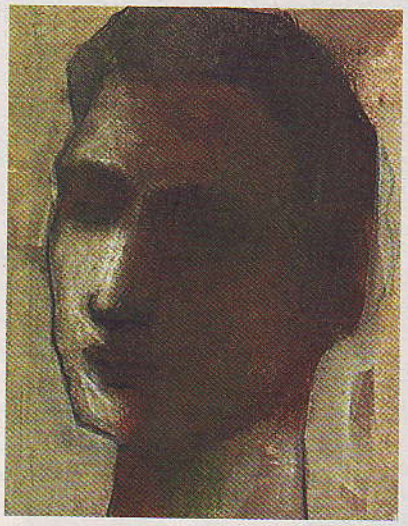

আই স্ট্রোক।

—আই স্ট্রোক! আপনি তো আজব লোক মশাই! এই অবস্থাতেও আপনি অফিস করছেন?

—করতে তো চাইনি। কিন্তু আজকের এই অ্যাপয়েন্টমেন্টটা, বড়সাহেব...

—রাখুন তো মশাই বড়সাহেব! আমাকে একটা ফোন করলেই আমি ডেটটা চেঞ্জ করে দিতাম। আরে মশাই আমরাও তো মানুষ, নাকি?

শুভেন্দু কী বলবে বুঝে ওঠার আগেই মিস্টার চ্যাটার্জি বললেন, ঠিক আছে আমি এক্ষুনি করে দিচ্ছি। আপনি রিসেপশনে গিয়ে বসুন, আমি ডেকে নেব।

শুভেন্দু আবার রিসেপশনে এসে বসল। বেশ বুঝতে পারছে ঘড়ির কাঁটার সঙ্গে সঙ্গে উৎকণ্ঠা বাড়ছে। অনেকদিন পর আজ আবার বুঝছে ঘণ্টা-মিনিট-সেকেন্ডের কী মূল্য। যতক্ষণ না ট্রেনের টিকিটটা কাটতে পারছে ততক্ষণ স্বস্তি নেই। দেখতে দেখতে ঘড়ির কাঁটা একটার ঘর পেরিয়ে গেল। শুভেন্দু আর বসে থাকতে পারল না। মিস্টার চ্যাটার্জির চেম্বারের দিকে গেল। দেখল দরজাটা বাইরে থেকে বন্ধ। পাশ দিয়ে একজন অল্পবয়সি পিওন যাচ্ছিল। তাকে জিজ্ঞাসা করল, ভাই মিস্টার চ্যাটার্জি...

সে মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বলল, লাঞ্চে গিয়েছেন। দেখছেন না একটা বেজে গিয়েছে!

শুভেন্দু বলল, লাঞ্চ তো দেড়টায় শুরু হয় বলে জানতাম।

—স্যার তো লাঞ্চে বাড়িতে যান, কাছেই থাকেন। তাই একটু আগে আগেই বেরিয়ে যান। তবে সময়মতো চলে আসবেন। বলে ছেলেটি হাঁটা শুরু করল।

শুভেন্দু হতাশার সুরে বলল, কখন আসবেন?

ছেলেটি যেতে যেতে উত্তর দিল, এই দুটো-সওয়া দুটো। চলে আসবে, চিন্তার কিছু নেই!

মিস্টার চ্যাটার্জি সময়মতোই এসেছেন। কিন্তু কাজ শেষ করে বের হতে হতে শুভেন্দুর তিনটে বেজে গেল। তবে এখনও আশার আলো আছে। অফিসে ফিরেই রওনা দিলে সাড়ে চারটের মধ্যে পৌঁছে যাবে। বুকিং কাউন্টার নিশ্চয়ই পাঁচটা সাড়ে-পাঁচটা পর্যন্ত খোলা থাকে। তবে অফিসাররা থাকলে হয়। লিফটের জন্য অপেক্ষা না করে জোর পায়ে সিঁড়ি দিয়ে নীচে নেমে আসল। দেখল গাড়িটা সামনেই পার্ক করা আছে। শুভেন্দুকে দেখে রাজু গাড়িটা এগিয়ে আনল। শুভেন্দু পিছনের সিটে বসে বলল, রাজু, ভাই একটু টেনে চালাও। বাইপাস ধরে নাও। একটু ঘোরা হলেও সময় বাঁচবে।

রাজু বলল, কিন্তু স্যার কাঁকুড়গাছি ঘুরে যেতে হবে যে।

শুভেন্দু এক রকম আঁতকে উঠল, কাঁকুড়গাছি! কাঁকুড়গাছি কেন?

রাজু বলল, বড়সাহেব সকালে একটা চেক দিয়েছেন। ক্রেডিট কার্ডের। ড্রপবক্সে ফেলতে হবে।

শুভেন্দুর ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে গেল। রাজুকে উদ্দেশ্য করে ভারী গলায় বলল, আজ ফেলতে হবে না, কাল ফেলো। বলছি না তাড়া আছে!

—কিন্তু বড়সাহেব বলেছেন আজই লাস্ট ডেট। আজকেই যেন ফেলি।

—তা এতক্ষণ কী করছিলে! ফেলে আসোনি কেন? শুভেন্দুর ঝাঁঝালো কণ্ঠে বলল।

—আসলে একটা ভাল পার্কিং পেয়ে গেলাম তাই আর বের হইনি। আর আমি কি করে জানব আজ আপনার তাড়া আছে! মহা সমস্যায় পড়া গেল তো!

—কোনও সমস্যা নেই। তোমাকে যা বলছি তাই করো। বড়সাহেবকে যা বলার আমি বলে দেব।

রাজু বুঝল তাড়াটা খুবই গুরুতর। না হলে শুভেন্দুদার মতো নরম লোক এমন ধমকে কথা বলবেন না।

গাড়িটা বাইপাস ধরে ছুটে চলেছে। বেশ জোরেই চলছে। কয়েকটা গাড়িকে প্রচণ্ড স্পিডে ওভারটেকও করেছে। একবার তো পাশাপাশি ঘষা লেগে যাওয়ার উপক্রম হয়েছিল। অন্য দিন হলে শুভেন্দু রাজুকে হালকা ধমকে স্পিড কমাতে বলত। সাবধানে চালানোর উপদেশ দিত। কিন্তু আজ মনে হচ্ছে চলুক, একটু জোরেই চলুক। শুভেন্দুর হঠাৎ বাড়ির কথা মনে পড়ে গেল। এতক্ষণ কাজের চাপে ভুলে ছিল। ভাবল, মোবাইলটা আজ সঙ্গে করে নিয়ে এলে পাশের টেলিফোন বুথটায় ফোন করে পিয়ালিকে ডেকে পাঠানো যেত। কেমন আছে এইটুকু অন্তত জানা যেত। এমনই একটা সমস্যা যাতে শরীরের সঙ্গে মনেও প্রচণ্ড চাপ পড়ে। কথা বললে মনটা হয়তো একটু হালকা হত। আজ মাঝেমাঝেই অনেক টুকরো-টুকরো স্মৃতি মনের মধ্যে ভেসে উঠছে। মোবাইলের কথায় মনে পড়ে গেল সেদিনের স্মৃতি। তখন সবে মাস তিনেক হল বিয়ে হয়েছে। একদিন অফিস থেকে ফিরতে পিয়ালি চা-জলখাবার দিয়ে বলল, বুঝলে, আমি চিন্তা করে দেখলাম আমাদের এই ল্যান্ডলাইনটা ছেড়ে দেওয়া উচিত।

অনেক খোঁজখবর নিয়ে ও প্রস্তাবটা সাজিয়েছিল। কিন্তু বোঝার ভুলে শুভেন্দুর আত্মমর্যাদায় ঘা মারল। শুভেন্দু বলল, কেন এতই অভাব নাকি যে, একটা টেলিফোন রাখতে পারব না?

ফোনে পিয়ালি যদি টিকিটের কথা জিজ্ঞাসা করে তবে কী উত্তর দেবে? সে আজ বিরাট একটা প্রবলেম সলভ করেছে। অফিসের অনেক টাকা বাঁচিয়ে দিয়েছে। অফিসই তার চোখের মণি। বউয়ের চোখের মণির যা হয় হয়ে যাক, এই মণিটাকে অক্ষত রাখতে হবে। কারণ এই মণিটাই তাকে মাস গেলে মাইনে দেয়। তার ওপর বড়সাহেবের প্রশংসা। মাঝে মাঝেই ঢাউস এসি গাড়ি চড়ার সুযোগ।

পিয়ালি বলল, ধ্যাত, তা বলছি নাকি! আমি হিসাব করে দেখেছি ল্যান্ডলাইনে খরচ অনেক বেশি। আমরা ক'টাই বা ফোন করি! রেন্টাল-টেন্টাল নিয়ে শুধু শুধু মাসে-মাসে এককাড়ি করে টাকা গুনতে হয়। তার থেকে এটা ছেড়ে একটা প্রিপেড মোবাইল নিয়ে নেব। বাড়ির কাজ চলবে। তার সঙ্গে বাইরে বের হলে নিয়ে বেরনো যাবে।

তখন ঘরে-ঘরে মোবাইলের চল হয়নি। শুভেন্দুর এসব ব্যাপারে উৎসাহ বা জ্ঞান চিরকালই কম। কিন্তু বুঝল কমার্স গ্র্যাজুয়েট গিন্নি হিসাবে পাকা মাথা। শুভেন্দু বেশি আলোচনায় না গিয়ে পুরো ব্যাপারটা গিন্নির সিদ্ধান্তের ওপরই ছেড়ে দিল। টুসটুসে মোবাইলটা আসতে আর একপ্রস্থ সমস্যা। পিয়ালির মত, ওটা শুভেন্দু অফিসে নিয়ে যাবে। শুভেন্দু ব্যাপারটা মেনে নিল না। পিয়ালিকে উদ্দেশ্য করে বলল, আমার মোবাইলের কী দরকার! বরং ওটা বাড়িতেই থাকবে। দরকারে আমি অফিস থেকে ফোন করে তোমার সঙ্গে কথা বলতে পারব।

—সে তো তুমি পাশের বুথটায় ফোন করেও আমাকে ডেকে নিতে পারো। কিন্তু তোমার সঙ্গে থাকলে আমি বরং দরকারে যোগাযোগ করতে পারব। আজকাল ট্রেন-বাসের যা অবস্থা, কখন কোথায় আটকে পড়বে। অন্ততপক্ষে খবরটা তো পাব! যুক্তিতর্কের জাল আরও বিস্তৃত হয়েছিল। শেষ পর্যন্ত শুভেন্দুর মতটাই প্রতিষ্ঠা পেয়েছিল। তবে আজকের জন্য ওটা নিয়ে এলেই বোধ হয় ভাল হত বলে শুভেন্দুর মনে হতে লাগল।

পার্ক সার্কাস কানেক্টর দিয়ে গাড়িটা মিনিট দু'য়েক ঠিকঠাক এগিয়েছিল। বিশ্বকর্মা বিল্ডিং-এর সামনের সিগনালে দাঁড়িয়ে গেল। শুভেন্দু দেখল, সামনে যত দূর চোখ যায় লম্বা গাড়ির সারি। শুভেন্দু মনে-মনে অস্থির হয়ে উঠল। যদিও সিগনাল সবুজ হল কিন্তু গাড়ির সারি এগতে লাগল রাস্তা ছুঁয়ে-ছুঁয়ে। শুভেন্দু রাজুকে জিজ্ঞাসা করল। রাজু, সামনে কিছু প্রবলেম হয়েছে বলে মনে হচ্ছে। তাই না?

রাজু উত্তর দিল, না স্যার। অফিস ছুটির সময় হয়ে এল। এখন থেকে রাত সাতটা-আটটা পর্যন্ত এরকমই চলবে।

—সেটা আগে বলোনি কেন? তা হলে এদিক দিয়ে না এসে মৌলালি হয়ে গেলেই ভাল হত।

—এখানে তো তাও চলছে। ওদিকের অবস্থা তো আরও খারাপ। যে হারে গাড়ি বাড়ছে তাতে আর কিছুদিন পরে রাস্তায় চলাই যাবে না। তার ওপরে আবার ন্যানো আসছে। রাজু শেষ কথাটার সঙ্গে হেসে উঠল। পরক্ষণেই পিছনে সাহেবের উৎকণ্ঠার কথা স্মরণ করে নিজেকে সামলে নিল।

প্রায় সাড়ে চারটে বেজে গেল চার নম্বর ব্রিজ পার হতে। বাঁদিকে একটা টেলিফোন বুথ দেখে শুভেন্দুর মনে হল একবার নেমে বাড়িতে একটা ফোন করে নিলে হয়। পরক্ষণেই নিজেকে সংযত করে নিল এই চিন্তা করে যে, তাতে আরও দেরি হয়ে যাবে। ট্রেনের টিকিট কাটাটা আরও বেশি গুরুত্বপূর্ণ। আর ফোনে পিয়ালি যদি টিকিটের কথা জিজ্ঞাসা করে তবে কী উত্তর দেবে? এটা বলবে যে, মোস্ট ওবিডিয়েন্ট, রেসপনসিবল এমপ্লয়ির মতো সে অফিসের ডিউটি করেছে? গলায় উচ্ছ্বাস ঢেলে এটাও পিয়ালিকে শুনিয়ে দেওয়া উচিত যে, সে আজ বিরাট একটা প্রবলেম সলভ করেছে। অফিসের অনেক টাকা বাঁচিয়ে দিয়েছে। অফিসই তার চোখের মণি! বউয়ের চোখের মণির যা হয় হয়ে যাক, এই মণিটাকে অক্ষত রাখতে হবে। কারণ এই মণিটাই তাকে মাস গেলে মাইনে দেয়। তার ওপর বড়সাহেবের প্রশংসা। মাঝে মাঝেই ঢাউস এসি গাড়ি চড়ার সুযোগ।

—রাজু, এসি-টা বন্ধ করে জানলাগুলো খুলে দাও তো, অস্বস্তি হচ্ছে। শুভেন্দু রেয়ার ভিউ মিররে রাজুর দিকে তাকিয়ে বলল।

রাজু বলল, বাইরে ভ্যাপসা গরম। কষ্ট হবে।

—তা হোক। তুমি জানলার কাচগুলো নামাও।

—নামাব! ধুলো ঢুকবে তো! গাড়ি নোংরা হবে। মুখে-চোখে ঢুকবে।

শুভেন্দু আদেশের স্বরে বলল, যা বলছি তাই করো।

শুভেন্দু অফিসে পৌঁছে দেখল গেটের সামনে শীতল বসে আছে। শীতল গেট পাহারার কাজ করে। বহু দিন ধরেই আছে তাই কথাবার্তা গার্জিয়ানসুলভ। তবে বিশ্বস্ত। শুভেন্দু জিজ্ঞাসা করল, কে কে আছে?

শীতল বলল, মলয়বাবুই শুধু আছেন। আজ বড়সাহেব টিফিনের সময়ই বেরিয়ে গিয়েছেন। তাই পাঁচটা-সওয়া পাঁচটার মধ্যেই সবাই কেটে পড়েছে।

শুভেন্দু ঘড়িতে দেখল পাঁচটা পঁয়ত্রিশ। ঠিক করল, ড্রয়ার থেকে টাকা ও কাগজপত্র নিয়ে এক্ষুনি বেরিয়ে পড়তে হবে। টিকিট পাওয়ার আর কোনও আশা নেই। তা হলেও একবার চেষ্টা করে দেখতে হবে। না হলে কী মুখে বাড়ি ফিরবে! অনেক সময় চেষ্টায় অসাধ্যসাধনও হয়। শুভেন্দু ডুবন্ত মানুষের মতো আশার খড়কুটোকেই জড়িয়ে ধরল। মলয় শুভেন্দুর পাশের টেবিলেই বসে। শুভেন্দুকে দেখে মলয় বলল, কীরে পিয়ালির চোখে নাকি স্ট্রোক হয়েছে শুনলাম?

শুভেন্দু সংক্ষিপ্ত উত্তর দিল, হ্যাঁ। অফিসে বসে গল্প ফাঁদার কোনও ইচ্ছা বা সময় কোনওটাই নেই।

মলয় বলল, ভেরি স্যাড। তুই ওর ব্যাপারটাই দেখ। অফিস নিয়ে আর চিন্তা করার দরকার নেই। আমরা কয়েকদিন সামলে নেব।

মলয় দীর্ঘদিনের বন্ধু হলেও শুভেন্দু ওর কথাতে বিরক্ত হল। যে ক্ষতি হওয়ার তো হয়েই গিয়েছে। ডাক্তারবাবু বারবার করে বলে দিয়েছেন যে, দিন চার-পাঁচেকের মধ্যে চিকিৎসা শুরু হলে এ-যাত্রায় রক্ষা পেয়ে যাবে। দেরি হলে চোখটা বাঁচানোর আর কোনও উপায় থাকবে না। দেখতে দেখতে দুই দিন পার হয়ে গেল। শুভেন্দুর মনে হল চারপাশে সবাই কেমন হৃদয়হীন। তার যে একটা দিন নষ্ট হয়ে গেল তার জন্য কারওর কোনও আফসোস নেই। স্বার্থের দুনিয়াটা চেনার দৃষ্টি বোধহয় বিপদে না পড়লে পাওয়া যায় না! শুভেন্দু চেয়ারে বসতেই মলয় এসে একটা খাম হাতে ধরিয়ে বলল, বড়সাহেব দিয়ে গিয়েছেন, ভেরি ইমর্ট্যান্ট। আমি চেক করে নিয়েছি, তাও তুই একবার দেখে নে।

শুভেন্দুর ইচ্ছা করল খামটা ছুড়ে ফেলে দিতে। আর এক মুহূর্ত সময় নষ্ট করার কোনও ইচ্ছা নেই। তা সত্ত্বেও ভালমানুষ স্বভাবটা হয়তো এখনও ওকে ছেড়ে যায়নি। খামটার মুখ খোলাই ছিল। ভিতরের কাগজগুলো এক ঝটকায় টেবিলে ফেলল।

টেলিফোনের ওপাশ থেকে পিয়ালির গলা ভেসে আসল। শুভেন্দু জিজ্ঞাসা করল, এখন কেমন লাগছে?

—ওই একই রকম। আর, তোমার টিকিটের কী খবর?

—হ্যাঁ, হয়ে গিয়েছে।

—কোন ট্রেন? কালকেরই তো? শুভেন্দু বুঝতে পারল দুশ্চিন্তায় পিয়ালি সারা দিন ছটফট করেছে।

—হ্যাঁ, আগামীকালের। সকাল আটটায়। তবে ট্রেন না প্লেন! বড়সাহেবের গিফট। আর ওই হাসপাতালের অ্যাপয়েন্টমেন্টটাও করে রেখেছেন। কাল দুপুর দুটোয়।

—বাঃ, বাঁচা গেল! পিয়ালির গলায় আনন্দের রেশ।

—তোমার চোখের ঝাপসা ভাবটা কমেছে না বেড়েছে?

—ঠিক বুঝতে পারছি না। তবে তুমি সামনে না থাকলে তো এমনিতেই ঝাপসা দেখি। কী করে বুঝব?

শুভেন্দু বুঝল এত টেনশনের মধ্যেও পিয়ালি সেন্স অফ হিউমার হারায়নি। শুভেন্দু রেসিপ্রকেট করল, জানো তো, আমার মনে হচ্ছে আমিও এতদিন ঝাপসা দেখতাম... স্বচ্ছ দৃষ্টি... ইয়ার্কি না, ফ্যাক্ট... মনের... এমনিই...

অঙ্কন: সুব্রত চৌধুরী